দৈনিক ইত্তেফাক

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি জটিলতা

প্রকাশ : ০২ সেপ্টেম্বর ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ

১৪-১৫ বছর আগের ঘটনা। তখন থাকতাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফুলার রোডের কোয়ার্টারে। ভোরে বেরিয়েছি জগিং করতে। ঠিক উদয়ন স্কুলের বাম পাশে ছাউনির নিচে ষাটোর্ধ্ব এক বৃদ্ধ তার মেয়েকে নিয়ে এক কোনায় চুপচাপ বসে আছেন। কাঁধে একটি পুরোনো ব্যাগ আর মেয়েটির হাতে একটি প্লাস্টিকের ফাইল। একটি পত্রিকা বিছিয়ে দুজনেই গা এলিয়ে বসে আছেন। এত ভোরে আঁধারে তাদের দেখে বেশ কৌতূহল জাগে। কাছে গিয়ে জিগ্যেস করি, কোথা থেকে, কীজন্য এখানে। ভদ্রলোকে বেশ অনুনয়-বিনয় করেই বললেন, মেয়েকে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়াতে নিয়ে এসেছি। প্রশ্ন করি–সারা রাত কি এখানেই ছিলেন? বললেন, হ্যাঁ। কুড়িগ্রাম থেকে গতকাল সকাল ৯টায় বাসে উঠি। প্রচণ্ড বৃষ্টির কারণে রাস্তায় জ্যামে পড়েছিলাম। গাবতলী বাসস্ট্যান্ডে নামি এশার আজানের সময়। এরপর লোকাল বাসে এসে এখানে পৌঁছাই রাত ১১টায়। আমার এলাকার একটা মেয়ে থাকে ভার্সিটির হলে। ওর কাছে আজ রাতে থাকতে এসেছে আমার মেয়েটি। কিন্তু পথে অনেক দেরি হওয়ায় হলের ভেতর ঢুকতে দেয়নি। ঢাকা শহরের কোথাও কিছু চিনি না, পরিচিত নাই কেউ। এক ছাত্র বলল এই এলাকায় শিক্ষকেরা থাকেন, নিরাপত্তা আছে। কেউ যদি ভালো মনে করে, বিশ্বাস করে তবে অবশ্যই রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করে দেবেন। আমি খুব অবাক হলাম, একটা স্টুডেন্ট আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পর জীবনের সবচেয়ে কঠিন একটি পরীক্ষার মুখোমুখি হবে। অথচ সে গত ২৪ ঘণ্টা ধরে বিরামহীনভাবে বাস জার্নি করেছে। খাওয়াদাওয়া বা ঘুম হয়নি। মাথা ঠিক আছে, বাচ্চাটিকে দেখে তা মনে হলো না। এ চিত্রটি আমাকে আজও ভাবায়, বিব্রত করে। কী কঠিন এক বাস্তবতার মুখোমুখি বাবা-মেয়ে। আমার মনে হয়, এ অবস্থা হরহামেশাই ঘটছে। হয়তো আমাদের চোখে পড়ে না।

প্রতি বছরই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি পরীক্ষা হচ্ছে। প্রায়ই মনে হয়, এ সম্পর্কে আমার লেখা উচিত। কথা বলা প্রয়োজন। ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয় প্রতি বছর এই সময়ে। এ সময়টিতে কয়েক লাখ পরীক্ষার্থী পাগলের মতো ছুটে বেড়ায় সারাদেশে। যে ছেলেটি একা একা কয়েক মাইল হাঁটেনি, সে তার জীবন গড়ার জন্য পাড়ি দিচ্ছে কয়েক শ মাইল পথ। শুধু শিক্ষার্থী নয় তাদের অভিভাবকও থাকেন, যারা সন্তানকে নিয়ে ছোটেন সারাদেশ। আর্থিক, শারীরিক, মানসিক–সব ক্ষেত্রেই নেতিবাচক প্রভাব পড়ে পরিবারের ওপর। তাছাড়া ফরমের দামও অনেক। কুষ্টিয়া বা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরমের মূল্য বেশ চড়া। এ বছর শুধু সেপ্টেম্বরে ১০-১২টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। আবার এর মধ্যে রয়েছে দুই থেকে চারটি পৃথক ইউনিটের

পরীক্ষা। শুক্র ও শনিবার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। অর্থাত্, সরকারি বন্ধ মাসের এই আট দিনে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল ইউনিটসহ মোট ২০টির অধিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে এতগুলো পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়া কীভাবে সম্ভব। আবার সবগুলো পরীক্ষায় উপস্থিত হতে না পেরে পূরণকৃত বাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরমের টাকা জলে যাবে।

তবে আশার কথা হচ্ছে, গত কয়েক বছর ধরে মেডিক্যাল পরীক্ষা হচ্ছে এক দিন, চমৎকার একটি সিস্টেম। ঢাকা মেডিক্যাল থেকে শুরু করে নীলফামারী মেডিক্যালের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে একটি দিনে, একটি প্রশ্নপত্রে। পরীক্ষার্থী তার যোগ্যতা অনুযায়ী ভর্তি হবেন। কষ্টের কথা হলো বাকি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়ে এভাবে পরীক্ষা কেন নেওয়া হচ্ছে না। কেন নিজেদের হীন স্বার্থের কথা ত্যাগ করতে পারছে না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। একজন পরীক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স না পেলে যায় জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। পরীক্ষার্থীকে সশরীরে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হবে, থাকতে হবে, খেতে হবে, আশ্রয় প্রয়োজন হবে। অভিভাবকদের ক্ষেত্রেও তা-ই হবে। কী এক ভয়াবহ অবস্থা!

বিশাল এক দুঃসহ লড়াই, ধকল, দুরবস্থা থেকে মুক্তি দিতে হবে পরীক্ষার্থী ও তার পরিবারকে। মেয়েদের ক্ষেত্রে আরো ভয়ানক অবস্থা। এগুলোকে দূর করতে হবে। স্বস্তি দিতে হবে অভিভাবক ও পরীক্ষার্থীদের। সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে মাত্র একটি অভিন্ন পরীক্ষার আওতায় আনতে হবে। তাছাড়া এই দুরবস্থা, এই লড়াই শেষ হবে না। সব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সব প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সব সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা হতে হবে।

তবে আশার কথা, এবার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গুচ্ছ ভর্তি প্রক্রিয়া পরীক্ষা নেওয়া শুরু করেছে। পরীক্ষার্থী তার মেধানুযায়ী ভর্তি হবেন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এটা খুব চমৎকার একটি প্রক্রিয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তা-ই হতে পারে। অতীতে চেষ্টাও হয়েছিল, শিক্ষা মন্ত্রণালয় উপাচার্যগণকে ডেকে মন্ত্রী মহোদয় মিটিং করেছিলেন। বলেছিলেন, কীভাবে এ প্রক্রিয়া চালু হতে পারে। মহামান্য রাষ্ট্রপতিও অভিন্ন পরীক্ষার বিষয়ে নানা পরামর্শ দিয়েছিলেন। পরীক্ষার্থীরা কীভাবে পরিত্রাণ পাবে এ নাকাল অবস্থা থেকে, সে পথ বলেছিলেন তিনি। উপাচার্যগণ বলেছিলেন, আমাদের কাউন্সিল আছে, বোর্ড আছে, সিন্ডিকেট আছে। সব সদস্যের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। তারপর সিদ্ধান্ত নিতে পারব। আমরা তো স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ইত্যাদি। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নেতৃত্বে একটি কমিটিও হয়েছিল। সেখানে ছিলেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিসহ বিশেষজ্ঞগণ। বিশেষজ্ঞগণ নানা সুপারিশ করেছিলেন বলে আমি জানি। যখন ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়, ঠিক তার আগে আগে এই মিটিং করেন কর্তৃপক্ষ। যার দরুন, ঐ সময়েই বিষয়টি নিয়ে হইচই শুরু হয় আবার দুদিন পর সব চুপচাপ। কোনো হোমওয়ার্ক করেন না তারা। ১০ বছর পরের স্ট্র্যাটিজি, প্ল্যান তৈরি করেন না। আমি যখন ইংল্যান্ডে ছিলাম, ওখানে দেখেছি, এ ধরনের ভর্তি পরীক্ষার সময় UCCA নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। সেখানে বিশ্বের অনেক দেশ থেকে আবেদনপত্র জমা পড়ে ভর্তির জন্য। UCCA সে আবেদনপত্র বাছাই করে এবং পরীক্ষার আয়োজন করে। ফলে পুরো ভর্তি পরীক্ষা নিয়মমাফিক, সুষ্ঠুভাবে এবং এক দিনেই শেষ হয়ে যায়। ইংল্যান্ডে এত বড়ো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে বাংলাদেশে কেন সম্ভব নয়? এখানে অনেক দক্ষ জনবল আছে, কাজ করার মানুষ আছে। দরকার শুধু একটি প্রতিষ্ঠানের। UCCA-এর মতো বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় সরকারি স্বায়ত্তশাসিত একটি আলাদা কমিশন থাকতে হবে। তাদের কাজ হবে সমস্ত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি নিয়ে কাজ করা। তারাই শিডিউল তৈরি করবে, তাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হবে। তারা পরীক্ষার্থীর যোগ্যতা ও পছন্দমতো সব মিলিয়ে মেধাক্রম, ভর্তি, অবস্থান নিরূপণ করবে। এজন্য দরকার সরকারের দৃঢ় ইচ্ছা।

আমার চিন্তানুযায়ী, এজন্য প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্টদের উদার মানসিকতা ও আর্থিক সুবিধাদি ত্যাগের মানসিকতা। অনেকেই জোর দাবি তোলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ করা যাবে না, তাদের ভর্তি নিয়ে কথা বলা যাবে না। নিজস্ব আইন আছে, হ্যাঁ আমিও মানছি তা। কিন্তু গত কয়েক দশকে অনেক কিছুই পালটে গেছে। নিয়মনীতিতে এসেছে আধুনিকতা। এ মুহূর্তে গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তির জন্য প্রয়োজন একটি আইন পাশ করা। স্বায়ত্তশাসন ঠিক রেখে শিক্ষার্থীদের ধকল কমাতে এই আইন সংসদের মাধ্যমে পাশ করা যেতে পারে। ভারতে জয়েন্ট ইন্টার্নস পরীক্ষা হচ্ছে। সুষ্ঠুভাবে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করছেন সব পরীক্ষায়। আমাদেরও সে রকমই পরিবেশ দরকার।

মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগে প্রতি বছর অ্যাডহকের মাধ্যমে লোক নিয়োগ, বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ বা মিটিং করে এ বিষয়ে স্থায়ী কোনো ফল আসছে না। ডেঙ্গু থেকে বাঁচার জন্য সিটি করপোরেশনের মেয়রদের মতো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখন চিন্তা করে ভর্তি জঞ্জাল থেকে বাঁচতে কোনোভাবে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস পার হলেই হলো। তারপর এসব আলোচনা আবার মৃত হিসেবে হয়ে যাবে। আফসোস হয়, এত বড়ো সমস্যার মূলে কেউ কুঠারঘাত করছে না।

n লেখক :চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।